বরাক উপত্যকার বিস্মৃত ভাষা শহীদ

- গৌতম কুমার দাস

বরাক উপত্যকার ভাষা শহীদদের কেউ মনে রাখে নি। বাংলা ভাষার জন্য একই দিনে (১৯মে, ১৯৬১) ১১ জন শহীদের আত্মবলিদান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বাংলা ভাষা বলা কওয়া লেখা নিয়ে সমস্যার শুরু। বাংলা ভাষার দাপ্তরিক অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল সেই সময়ের আসামের কংগ্রেস সরকার। বরাক উপত্যকায় সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শিলচরে গর্জে উঠেছিল আসাম রাইফেলস্ এর শয়ে শয়ে বন্দুকের নল। মাথায়, পিঠে, বুকে গুলি নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল অসংখ্য তরুণ তরুণী। আহত অজস্র, নিহত ১১। শিলচরের তরুণ-তরুণীর রক্তস্নাত প্রতিরোধে বরাক উপত্যকার উপর অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ফেরত নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল সেদিনের কংগ্রেস সরকারকে। জয়ী হয়েছিল ১১ জন শহীদের আত্মবলিদান। বাংলা ভাষার স্বাধিকারে বরাক উপত্যকার মানুষ নতুন করে ফিরে পেয়েছিল বাঙালিয়ানা। বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, শিলচর জুড়ে ঘটনার সূত্রপাত ১৮ই মে, ১৯৬১। আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা যুগশক্তির সম্পাদক বিধুভূষণ চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ সেন ও নলিনীকান্ত দাস-এর ১৮ই মে গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে বরাক উপত্যকা জুড়ে হরতাল চলছিল ১৯মে, ১৯৬১। এতসব কথা একটানা বলে চলেছিলেন সেদিনের সতেরো বছরের কিশোর আইএসসি'র ছাত্র সন্তোষ দে। কাছাড় জেলার উধরবন্দের বাসিন্দা। এখন তিনি ৭২। তাঁর কথায় সেদিন সকাল থেকেই দিনটি ছিল ছমছমে, আতঙ্কের ও বড্ড শুনশান। চাপা উত্তেজনা চারদিকে কিন্তু কলরবহীন। হরতাল সফল করার লক্ষ্যে বরাক উপত্যকার শিলচর, হাইলাকান্দি, ও করিমগঞ্জে প্রতিবাদী তরুণ-তরুণীর নীরব জমায়েত ও সুশৃঙ্খল পিকেটিং চলছিল আদালত ও সরকারি অফিস চত্বরে। শিলচর স্টেশন চত্বরেও। উদ্দেশ্য একটাই - ট্রেন চালাতে না দিয়ে হরতাল সফল করা। হরতালের দিন সকাল থেকে শিলচর স্টেশনে একটিও টিকিট বিক্রি হয় নি। হরতাল ছিল অবাধ ও শান্তিপূর্ণ। দুপুর বারোটা অবধি কোন ঘটনা ঘটেনি। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। বেলা আড়াইটে নাগাদ কাটাগড়া থেকে একটা বেড ফোর্ড ট্রাকে ন'জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে তুলে নিয়ে যাবার পথে আন্দোলনকারীরা ওদেরকে শিলচর স্টেশন চত্বরে দেখে ফেলে। ওদের এই গ্রেপ্তারি-তে শিলচরে বিক্ষোভরত তরুণ-তরুণীদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বিক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে। ট্রাক ঘিরে ফেলে উত্তেজিত জনতা। বেগতিক দেখে ট্রাকের ড্রাইভার ও পুলিশ রক্ষীরা আন্দোলনের ফাঁকতালে কেটে পড়ে। সত্যাগ্রহীদের উত্তেজিত জনতা মুক্ত করে দেয়। তারপরপরই কেউ একজন বেডফোর্ড ট্রাকে

আগুন লাগিয়ে দেয়। ট্রাক দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। ঘটনাস্থলে এসে পড়ে দমকল বাজিনী, প্যারামিলিটারি ফোর্স ও আসাম রাইফেলস্ এর বিরাট পুলিশ বাহিনী। ওরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যে যার কাজ শুরু করে দেয়। তার মাঝেই কাটাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রেবতি পাল ট্রাকে আগুন দেখেই 'ফায়ার' 'ফায়ার' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। রেবতি পালের অধীনে থাকা আসাম রাইফেলস্ 'ফায়ার'-এর অর্থ গুলি চালানোর নির্দেশ ভেবে পাঁচ মিনিটেই ১৭ রাউন্ড গুলি চালিয়ে দেয়। সঙ্গে চলে পুলিশের রাইফেলের বাঁটের গুঁতো সহ লাঠি-চার্জ। নিরস্ত্র অসহায় তরুণ তরুণী-গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে। সেদিনই ১১ জন শহীদ হয়। ভাষা-শহীদ। এই বিশ্ব ভাষার জন্য একই দিনে এক সঙ্গে ১১ জন শহীদের আত্মবলিদান আর কোথাও দেখেনি। ভাষা শহীদের পুন্য ভূমিরূপে বরাক উপত্যকার শিলচর নাম লেখায় ইতিহাসের পাতায়।

সেদিন দিদি প্রতিভার কথা শুনলে হয়তো কমলাকে ভাষা-শহীদ হতে হতো না। শিলচরে পুলিশের গুলিতে নিহত ১৬ বছর বয়সী কিশোরী কমলা ভট্টাচার্য পৃথিবীর ভাষা শহীদের ইতিহাসে একমাত্র মহিলা শহীদ। ১৮মে তার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ হয়েছিল। ফল প্রকাশের পূর্বে তার খুব ইচ্ছে ছিল টাইপিং-টা অন্তত শিখে ফেলবে। স্বপ্ন ছিল অন্তত পক্ষে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার। ছোট বেলায় পিতৃহীনা কমলাদের বড়োই অভাবের সংসার। শিলচরে ভাড়াবাড়িতে বাস। মেজ দিদি স্কুল শিক্ষিকা প্রতিভার মাইনের টাকায় কোন রকমে সংসার চলে। স্কুলের পাঠ্য বই কেনার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। অন্যের বই থেকে প্রতিদিনের পাঠ নিজের খাতায় লিখে নিয়ে এসে পড়া চলতো কমলার। একবার বড় দিদি বেনুকে একটা ডিক্সনারি কিনে দিতে বলেছিল কমলা। পয়সার অভাবে নার্স চাকুরিতে প্রশিক্ষণরতা বেনু বোন কমলাকে একটা ডিক্সনারি পর্যন্ত কিনে দিতে পারে নি।

১৯মে দিদি প্রতিভা কোনমতেই কমলাকে শিলচর স্টেশনের জমায়েতে আসতে দিতে চান নি। তাঁর মনে বিপদের আশঙ্কা ছিল। কমলাকে বিপদের সেই কথা বলেও ছিলেন প্রতিভা। কমলা তবু এসেছিল জমায়েতে। তাদের শিলচর পাব্লিক স্কুল রোডের ভাড়া বাড়ি থেকে, স্নান সেরে, ধোয়া শাড়ি পরে অন্য আরো ২২ জন কিশোর কিশোরীর সঙ্গে। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় একটা টুকরো কাপড় মা সুপ্রাবাসিনী কমলার হাতে দিয়েছিলেন। কাঁদানে গ্যাস থেকে চোখ বাঁচাতে। কমলা - মঙ্গলা দুই মেয়ে ও বকুল - বাপ্পা দুই ছেলে জমায়েতে থাকায় মা সুপ্রাবাসিনীর বাড়িতে মন টেকে নি। দুপুর দুপুর মেয়েদের খোঁজ নিতে শিলচরের জমায়েতে মা চলে আসেন। মে মাসে গ্রীষ্মের তপ্ত রোদ্দুরে খালি পায়ে হেঁটে আসা মায়ের পা জল দিয়ে ধুয়ে দেন কমলা ও প্রতিবাদী মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় জমায়েত

স্থানে বিলোনো সরবতের গ্লাস মায়ের হাতে তুলে দেন। মা বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরপরই ঘটনার সূত্রপাত। ট্রাকে আগুন দেখে পুলিশের বেপরোয়া হয়ে ওঠা ও লাঠি চার্জ। রাইফেলের বাঁটে আঘাত পেয়ে বোন মঙ্গলা কমলার সাহায্য চেয়ে 'দিদি' 'দিদি' বলে ডাক পাড়ে। সাহায্যের জন্য বোনের দিকে এগিয়ে যায় কমলা। তখনই একটি গুলি কমলার চোখ দিয়ে ঢুকে মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। হাসপাতালে কমলার মৃত্যু হয়। মঙ্গলা প্রাণে বাঁচে। এক মাস পরে তার জ্ঞান ফেরে। বাকি জীবন মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে কাটিয়ে দেয় মঙ্গলা। দুই ভাই বকুল ও বাপ্পাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও পরে ছেড়ে দেয়। একই পরিবারের চার জনের নাম ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ষোলোয় শহীদ হন কমলা ভট্টাচার্য। কমলার ব্রোঞ্জ মূর্তি তার স্কুল ছোটেলাল শেঠ ইন্সটিটিয়্যুট-এর প্রাঙ্গনে বসিয়ে ২০১১ সালে ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তীতে তাঁর আত্মবলিদানের উদ্দেশ্যে নতমস্তকে প্রণাম জানায় শিলচরবাসী সহ বরাক উপত্যকার মানুষ। ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় ভাষা শহীদ মিনার। শিলচরে স্টেশন সংলগ্ন গুলি চালনার ঘটনাস্থলে নির্মিত শহীদ স্তম্ভে ১১ জন শহীদের চিতাভস্ম ভস্মাধারে এখনো রাখা আছে।

উধরবন্দের বাসিন্দা সন্তোষ দে ১৯মে, ১৯৬১ দিনটির কথা তাঁর স্মৃতির ঝাঁপি থেকে গড় গড় করে বলে চলেছিলেন। সন্তোষ দে তখন গুরুচরণ কলেজের আই এস সি স্তরের ছাত্র। ১৯মে কলেজে ঢুকতেই ফিজিক্সের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে সন্তোষ দে সহ আই এস সি-র সব ছাত্রকে বারণ করেছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা রুচিকা দি। উধরবন্দ তখন গাঁ। গাঁয়ের কলেজ পড়ুয়া সন্তোষ দে ১৯মে, ১৯৬১ দিনটিতে ঘটনার পর এসেছিলেন। পরদিন (২০মে, ১৯৬১) শহীদদের মরদেহ নিয়ে মিছিলে পথ হেঁটেছিলেন। তাঁর মনে আছে উল্লাসকর দত্ত শহীদদের সম্মান জানাতে সকলের নামে একটি করে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন। কমলার মতো শচীনের কথাও সন্তোষ দে-র বুকে আজো বাজে। শচীন্দ্র চন্দ্র পাল পুলিশকে বলেছিল, ''গুলি যদি মারতেই হয়, বুকেই মার।'' পুলিশের গুলি শচীনের বুক ফুঁড়ে চলে গেছিল। তাঁর মনে পড়ে শহীদ কানাই লাল নিয়োগীর কথা। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে কানাইলাল কোন ভাবে জড়িত ছিলেন না। ওর ভাই রেলকর্মী। রেলের কোয়ার্টারে থাকতো। ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে কানাইলাল শিলচরে এসেছিল। গুলিগোলার শব্দে কোয়ার্টার থেকে ঘটনাস্থলে আসামাত্রই গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়ে যান কানাইলাল নিয়োগী। স্মৃতিচারণে ক্রমে আত্মমগ্ন হয়ে যেতে থাকেন শিলচর উধরবন্দের বাসিন্দা ৭২ বছর বয়সী শ্রী সন্তোষ দে।

বরাক উপত্যকায় ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে যখন আসামের কংগ্রেস সরকার অসমীয়াকে রাজ্যের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে ঘোষণা করে। এই ঘোষনার ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। প্রতিবাদ জানালে অসমীয়ারা বাঙালী হিন্দুদের উপর চড়াও হয়। হিংসা এতটাই বাড়তে থাকে যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে প্রায় ৫০,০০০ বাঙালী হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে এবং প্রায় ৯০,০০০ বাঙালী হিন্দু বরাক উপত্যকা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতে পালিয়ে বাঁচে। কামরূপ জেলা সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোপাল মেহরোত্রা কমিশন রিপোর্টে দেখা যায় শুধু কামরূপ জেলার ২৫টি গ্রামে ৪০১৯টি কুঁড়ে ঘর ও ৫৮ টি কোঠা বাড়ি মাটিতে গুঁড়িয়ে গেছে। এই ঘটনা বাঙালী প্রধান বরাক উপত্যকায় প্রভাব ফেলে। তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অসমীয়াদের মধ্যে ছিল অন্য সমীকরণ। সমাজবিদ্যার একসময়ের ছাত্রী শিলচরের শিবানী দে প্রাঞ্জল ভাষার সেই সমীকরণের অন্তর্নিহিত জটিলতার কথা সহজ সরল ব্যাখ্যা করে বোঝান - অনেক সিলেটিরাই দেশভাগের সময় সব কিছু হারিয়ে এদেশে আসে। অনেক জমিদার ভিখারী হয়ে যায়। প্রথমে ওরা উদ্বাস্তু শিবিরে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে স্থানীয় মানুষদের থেকে ক্রমে এগিয়ে যেতে সিলেটিদের তেমন একটা অসুবিধা হয়নি। নিজেদের বাসস্থান জোগাড় করতে সিলেটিদের খুব যে লড়াই করতে হয়েছে তা নয়। কিন্তু আসামের কংগ্রেস সরকার বুঝে ফেলে এভাবে চললে গুয়াহাটি অতি সত্বর বাঙালীদের অধিকারে চলে আসবে, তখনই লড়াই শুরু হয়। চলে ভাষা রক্ষার লড়াই। পরে হিন্দু বাঙালী ও মুসলিম বাঙালীর মধ্যে বিবাদ ঝামেলা বাধানোর কাজ শুরু করে দেয় ওরা। মুসলিমদের বোঝাতে শুরু করে যে হিন্দু বাঙালীদের সঙ্গে লড়তে হলে ওদের নিজেদের মাতৃভাষা অসমীয়া লিখে দিতে হবে। এভাবেই বাঙালী মুসলিমদের সঙ্গে নিয়ে অসমীয়ারা নিজেদের (অসমীয়া-ভাষীদের) সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণ করে। অনেক অসমীয়া মুসলিম এখনো দেখা যায় যারা অসমীয়া ভাষায় কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। জোর করে তাদের মাতৃভাষা বদলে দিয়েছিল সেকালের আসামের কংগ্রেস সরকার। এভাবেই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বাঙালীদেরকে দিয়েই লড়াই জারি রেখেছিল অসমীয়ারা। কিন্তু অসমীয়ারা তখন যা বুঝে উঠতে পারে নি, এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ওদের এই রাজনীতির সমীকরণে আসাম বর্তমানে প্রায় মুসলিম গরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এখন শিলচরে মুসলিম জনসংখ্যা অর্ধেকের কিছু কম কিন্তু বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এলাকায় অর্ধেক জনসংখ্যা ওদেরই।

বরাক উপত্যকার শিলচর ভাষা শহীদের শহর। মাতৃভাষার অধিকার লাভের জন্য প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলার শহর। কেমন ছিল সাবেক শিলচর; সিলেটিদের ভিটে গড়ে তোলার পূর্বে কাদের বসতি ছিল শিলচর - এমন সব প্রশ্নের উত্তরে শিবানী দে বলে - শিলচর খুব যে পুরানো শহর তা কিন্তু নয়। ব্রিটিশরা আসামের চা-পাতা রপ্তানী করার উদ্দেশ্যে শিলচর গড়ে তোলে। ক্রমে বরাক নদীর পারে জাহাজঘাটা নির্মিত হয়। বরাক নদী বরাক উপত্যকাবাসীর প্রাণ। এই নদীর সঙ্গে বরাক উপত্যকার অর্থনীতি জড়িয়ে। বরাকের জলসেচে চলে চাষবাস। তার জলে জন্মায় হরেক প্রজাতির মাছ। বরাক ছাড়াও আর একটি নদী এখানে বয়। নাম কুশিয়াড়া। কুশিয়াড়া নদীর তীরেও সিলেটিদের বাস। সিলেটিরা বরাক উপত্যকায় আসার পূর্বে এই এলাকায় কাছাড়িদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস ছিল। ওদের এখনো বাস আছে এখানে। পদবি এদের দেব, দেবরায়, দেবমজুমদার। কাছাড়ি ছাড়া বাস করতো বর্মন পদবিধারী রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। কাছাড়ি, রাজবংশী সবই উপজাতি-ভুক্ত। শিলচরে তখন কাছাড়ি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাধান্য। কাছাড়িদের রাজা ছিল। রাজধানী ছিল ডিমাপুর। পরে শিলচরের খাসপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এখনো সেখানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। তবে বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ বেশ পুরানো শহর। পূর্বে বাংলাদেশের সিলেট জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেশভাগের পরে ভারতের আসাম রাজ্যের অধীনে আসে। দেশভাগের পরে শিলচরে সিলেটিরদের অভিবাসন শুরু হয়। শহর পত্তনের সঙ্গে শুরু হয় সিলেটি সমাজ ও সংস্কৃতি।

কাছাড়ি, বরাক উপত্যকা, ভাষা আন্দোলন বিষয়ে শিবানী দে'র ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে জিজ্ঞাসা বেড়ে যায়। তার কাছে প্রশ্ন রাখি - শিলচরে কাছাড়ি-রা কি কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই উদ্বাস্তু সিলেটিদের ভিটে গড়ার জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল? উত্তরে শিবানী বলে, কাছাড়িরা সংখ্যায় খুব কম ছিল। ওরা পাহাড় জঙ্গলে থাকতে বেশী পছন্দ করতো। সে কারণে করিমগঞ্জ হয়ে শিলচর পৌঁছে বসতি সহ ধান জমির ক্ষেত গড়ে তুলতে সিলেটিদের তেমন বেগ পেতে হয় নি। কাছাড়িদের সঙ্গে সিলেটিদের সম্পর্ক বরাবরই ভালো। সংখ্যায় অল্প হলেও কাছাড়িরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালীদের সঙ্গে শিলচরে সহাবস্থান করছে। ওরা শিক্ষিত, শহরবাসী, প্রায় সবাই বাঙালী ও বাংলা ভাষী। তবে কাছাড়িদের আদি বাসস্থান বাংলাদেশ (বর্তমান) নয়। বরাবরই ওরা আসামের অধিবাসী। শিলচরের ভাষা শহীদদের প্রতি দুর্বলতা কাছাড়িদের থেকে কোন দিন লক্ষ্য করেছে কিনা এমন প্রশ্নে শিবানী বলে, আছে, আছে। কাছাড়িদের মধ্যে একজন ১৯৯১ সালে শহীদ হয়েছেন করিমগঞ্জে। তার নাম বাবুল দেব। ওর নামে একটি রাস্তার নাম বাবুল দেব সরণি। বরাক উপত্যকার শিলচরে, সিলেটি-রা ছাড়া আর

কেউ নেই - পুরোটাই সিলেটিদের - এমন কৌতুহলের জবাবে শিবানী বলে, পুরো শিলচর শহরটাই সিলেটিদের দখলে তবে কিছু ঢাকার লোক আছে কিন্তু ঘটি একেবারেই নেই। শিলচরে ভাষা শহীদ সবাই সিলেটি। গোত্রে হিন্দু বাঙালী।

বাংলা ভাষার জন্য প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, জমায়েত, আত্মত্যাগ, শহীদ - তবু ১৯মে, ১৯৬১ কেন ২১ ফেব্রুয়ারীর মতো চিহ্নিত নয়, আপামর বাঙালীর মনন ও চিন্তনে কেন সাড়া জাগায় না? আমার এমন প্রশ্নের উত্তরে শিবানী দে সমাজ বিশ্লেষণের পথে এগোয়। তার সঙ্গে তার শৈশব থেকে লালিত ক্ষোভ এসে মেশে। সে বলে, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা শিলচরের সিলেটিদের বাঙালী বলে মানতেই চায় না। সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি কেমন যেন ওদের সঙ্গে আমাদের ভেতরে ভেতরে একটা দূরত্ব ঘনিয়ে থাকে। ভাবতে অবাক লাগে ছোটবেলায় উত্তরবঙ্গে বেড়াতে গেলে কেউ কেউ হঠাৎই জিজ্ঞাসা করে বসত - তোমাদের ওখানে লোকেরা কি জঙ্গলে থাকে? ওখানে কি ইঁট সিমেন্টের ঘরবাড়ি হয়? শিলচরে কি বিদ্যুৎ আছে - ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ সিলেটিরা বাংলার একটা অংশে তো একদিন বাস করত। সিলেটি সংস্কৃতি কতটা সুন্দর, সরল ও সাবলীল - তা বোধ হয় সবাই জানে না। বাইরের বাঙালীদের ধারনা শিলচরে সিলেটিরা বোধ হয় আজো আদি মানবের পর্যায়ে আছে। বিশ্বজুড়ে বাঙালীরা ২১শে ফেব্রুয়ারির কথা জানে, দিনটিও মানে অর্থাৎ ভাষা দিবস হিসাবে পালন করে থাকে। কিন্তু আপন দেশেই যে কতো বাঙালী স্বাধীনতায় দেশভাগের জন্য সব কিছু হারিয়ে এসেছে, ভাষার জন্য জীবন বিসর্জণ দিয়েছে, কতো জমিদার ভিখারী হয়েছে, কতো লোক আস্ত একটা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সত্তর বছর ধরে লড়াই করে চলেছে, তার খবর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা রাখে না। এখানকার শিলচরের তরুণ প্রজন্মও লড়াই করবে কিভাবে তা ওরাই জানে। শিক্ষিত যুবক -যুবতীদের চাকুরি নেই, সবাইঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ দু'চার হাজার যেটুকু রোজগার করছে, তার সবটুকুই নেশায় ওড়াচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের জন্য খুব কষ্ট হয়। জানি না কবে ওরা ভালো দিনের মুখ দেখবে। তবে মনে হয় না ওরা (তরুণ প্রজন্ম) সম্পূর্ণ চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ওরা ভোলেনি ভাষা শহীদদের, অথবা তাদের আত্মবলিদান।"

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন ও ভাষা শহীদদের বিস্মৃতির কথা শুনে আসামের অর্থনীতিবিদ্ সুচেতা চ্যাটার্জী তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন। শেকড় যার সিলেটে। সুচেতাদের প্রজন্মকে আসামে বলে 'বঙ্গাল' আর পশ্চিমবঙ্গে ওরা 'বাঙ্গাল'। ঘর ছাড়া বাস্তুভিটে হারানো বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অধ্যুষিত উদ্বাস্তুদের 'বঙ্গাল' ও 'বাঙ্গাল' হলো 'ব্রান্ড' নাম। এসব ব্যতিরেকে বরাক

উপত্যকার উদ্বাস্তু বাঙ্গালীর নতুন কোনোও পরিচয়ে স্বপ্ন দেখে চলেন সুচেতা চ্যাটার্জী। তাঁর কথায় বরাক উপত্যকার উদ্বাস্তু বাঙালীদের স্বাধীন ভারতের সরকার পুনর্বাসন তথা অর্থনৈতিক অবস্থার কথা একদিনের জন্যও ভাবে নি। আসামে সিলেটি উদ্বাস্তুদের জন্য কোনও সরকারি পরিকল্পনা কেউ কখনো দেখে নি।

আপামর বাঙ্গালী সমাজের ভাষার উৎস, ভাষা আন্দোলন, ভাষা শহীদ, ভাষার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে সমীক্ষা চালানো বিশ্বেন্দু নন্দের ব্যাখ্যা বেশ গভীর। শ্রী নন্দের কথায় - ''যে দেশ সংখ্যা গরিষ্ঠের ভাষার দাবি নিয়ে জন্মায়, সেই দেশই তার জন্মক্ষণের শুরু থেকেই যেখাবে অন্য সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্প জীবনধারণ ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয় নি। যারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাদের বাঙালী বিদ্বেষী তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সমাজের নিজেদের ভৌগোলিক এলাকা দখল করে বাঙালীদের বসানো হয়েছে। বাঙালী হিসাবে, নিজের ভাষা নিজে বলার অধিকারের সমব্যথী হিসাবে আগ্রাসী জাতি বিদ্বেষী, ইউরোপীয় জাতি রাষ্ট্রবাদী বাঙালীয়ানাকে ধিক্কার জানানো উচিৎ। কলকাতা বা ঢাকায় বাংলা ভাষাভাষীদের ইংরেজি বা হিন্দির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার অধিকার এদের নেই। এই ইউরোপপন্থী বাংলা প্রসার আন্দোলন, আগ্রাসী হিন্দি আর ইংরেজি সাম্রাজ্যবাদের দোসর।''

ভাষা শহীদ ও ভাষা আন্দোলনের বিস্মরণের কারণ হিসাবে সমাজতাত্ত্বিক দীপংকর দে অবশ্য অন্য কথা বলেন - ''আসলে এপার বাংলার যারা ভদ্রলোক, বুদ্ধিজীবী তারা শাসকের ভাষা ভালো বোঝে। আগে ফারসি, পরে ইংরেজি, আর এখন হিন্দি - বাংলা ভাষার প্রতি এদের কোন দায় নেই'' দীপংকর বাবুর কথা বিশ্লেষণ করে বিশ্বেন্দু নন্দ সরল ব্যাখ্যা করে দিয়ে বলেন - ''দীপঙ্কর দা যাকে বলছেন ভদ্রলোক, বুদ্ধিজীবীদের বাংলা - সেটি আদতে ঔপনিবেশিক বাংলায় তৈরী হয়েছিল প্রথমে আরবি ফারসি ক্ষমতাধর, পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিত আর তাদের অনুগামী ইংরেজবিদ্ মানুষের হাতে। তাঁর সঙ্গে গ্রামবাংলার বাংলা ভাষার সম্পর্ক কোনদিন ছিল না, নেই, থাকবেও না আগামী দিনে। বাংলা ছিল, আছে, থাকবে আম জনতার গ্রাম বাঙালীর মুখে, গীতি কবিতায়, মঙ্গল কাব্যে, নাম সাহিত্যে, গ্রামে গঞ্জে অনুষ্ঠিত নানান ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। বাংলা ছিল আছে থাকবে।''

এমনই কত শত গভীর চিন্তাশীলতার মধ্যেই হয়তো নিহিত রয়েছে বিশ্ব-বাঙালীর বরাক উপত্যকার ভাষা শহীদদের বিস্মরণের কারণ। বাংলা ভাষা আজ আগ্রাসী ইউরোপিয়ান ভাষার

আলেয়ার আলোর পেছনে দৌড়ে চলেছে। ইংরেজ আমলে সাহেবরা বাংলার মাটিতে এসে এক-দু বছরের মধ্যে শুধু সংস্কৃত-চর্চার মাধ্যমে বিদ্বান হয়ে উঠত না, ভাষা চর্চা করে বইটই লিখে প্রাচ্যের ভাষা পণ্ডিতের তকমা পেয়ে যেত। বাংলা সেই থেকে অ্যাঙ্গলিসাইজড্ হতে শুরু করে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বাঙালীয়ানার কুলীন বাংলা ভাষীদের অন্য ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব। অসমীয়া, ওড়িয়া-ও সব বাংলা ভাষা থেকে এসেছে, রাজবংশী ভাষাও তো 'বাহে' ভাষার... ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলা ভাষা পণ্ডিতদের এমন নাক সিটকানোর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ক্রমে ঔপনিবেশিক প্রভাবে দুষ্ট ও হতচকিত এবং তা অন্য ভাষাকে, তার মাতৃভাষাকে ক্রমে গৌন ভাষার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বাংলা ভাষার এই ক্রম-অপসারণশীলতা বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, ভাষা শহীদদের বিস্মৃতির অন্যতম কারণ। তাছাড়া বরাক উপত্যকার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে ভৌগলিক দূরত্ব (মাঝে বাংলাদেশ) ভাষা আন্দোলনকালী ও শহিদদের ভুলতে বসার অন্যতম কারণও বটে।

বরাক উপত্যকার ভাষা শহীদ ও আন্দোলনের বিস্মৃতির কারণ খুঁজতে গিয়ে শিলচরের শিবানী দে-র কথা বারে বারে চিন্তার গভীর থেকে উঠে আসে - ''পৃথিবীর মধ্যে ভারত সব চাইতে ভুক্তভোগী দেশ, ভারতের মধ্যে আসাম, আর আসামের মধ্যে বরাক উপত্যকার অবস্থা যে কি তা বাকিরা সবাই জানে। ভাষা আন্দোলন তিন তিনবার হয়েছে। ১৯৬১এর ১১ জনের সঙ্গে পরে আরো ৩ জন শহীদ তালিকায় যুক্ত হয়েছে। প্রতি দশ বছর অন্তর আসাম সরকার বরাক উপত্যকায় কিছু একটা ঘটায় আর আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জে। শুধু বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা নয়; মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, রেললাইন পাতা, ট্রেন চালানো - সবেতেই বরাক উপত্যকার মানুষকে অসম সরকারের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। অসম সরকার এমনি এমনি এসব বরাক বাসীকে উপহার দিয়ে দেয়নি। আসলে একটি আন্দোলন শুরু হলে বাকি আন্দোলনগুলি তার পিছু পিছু ধেয়ে আসে। মাঝে মধ্যে আন্দোলনের স্মৃতির উপর মরচে পড়ে। অসম সরকার ঘষে মেজে দিলে ফের আন্দোলন চালু হয়ে যায়। বরাকবাসীর ভাষা শহীদ ও ভাষা আন্দোলন এমনটাই।